ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 624-636
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.252

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে ‘মেয়েলি সংলাপ’

ড. পৌলোমী রায়, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The book ‘Meyeli Sanglap’ by Sutapa Bhattacharya, written in the style of chat-diary and storytelling(2005), is an original experience of women’s empowerment and the expression of women’s own voices. In this book, beyond the pattern of conventional language, the author have deliberated women’s issues- the world of discussion, dialogue - conversation, poetry - songs and contemporary events. This book is not just human, but also a guide of humanistic thought and shows the way for women liberation. In the fictional gathering of friends named ‘Sakhi-Sanglap’(Friendship conversation), very subtly, an inspired message to society is presented through women’s discussions. The writer has created a fictional gathering called ‘Bandhusabha’ with the new inauguration of ‘Sakhi-sanglap’. In this gathering, the writer has placed various fictional female characters in the forefront, and the analysis of those writings is done in other’s voice. In this framework, human life and humanistic life are discussed. Here some important topics that have emerged are women’s bondage, marriage, family, independence, abortion, culture, politics, social politics, sexual freedom, religion, education-skills, laws- regulations related with women empowerment and various aspects of artistic expression. To show the voice of women, the writer sets the examples from various fields of literature and real facts. As a responsible citizen, she claims justice to save the legacy & heritage of independent women and their voice of love. The final refuge of this discussion is Rabindranath Tagore. In this tradition ‘Meyeli Sanglap’ is not just about women’s word or dialogue, it rises from being bound to a humanistic conversation.

Keywords: women empowerment, women freedom, cultural politics, Legacy, Humanistic attitude

আড্ডা-ডায়েরি ও কথোপকথনের ঢঙে লেখা সুতপা ভট্টাচার্যের ‘মেয়েলি সংলাপ’ (২০০৫) নারীমনস্তত্ত্ব ও নারীর নিজস্ব ভুবন উন্মোচনের এক অভিনব অভিজ্ঞান। প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে নারী সমস্যা সম্বলিত আলোচনার জগৎ, সংলাপ-সঞ্চরণ, কবিতা-গান-হাল আমলের ঘটনাবলি নিয়ে এই বইটি শুধু মানবী নয়, মানবিক চিন্তারও পথপ্রদর্শক। কল্পনির্ভর সখীদের সভায় বিন্যস্ত মেয়েলি আলোচনায় খুব সাবলীলভাবেই পরিবেশিত হয়েছে সমাজের প্রতি প্রেরিত জরুরি বার্তা। মনীষা ও অহনার উদ্যোগে লেখিকার বাড়িতে নানান গুণীজনদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ‘বন্ধু সভা’, তারই নব রূপায়ণ ‘সখী সংলাপ’ নামে একটি সভা কল্পনা করে নিয়ে লেখিকা নিজেরই ভাবনার বিন্যাস বসিয়েছেন নানা কাল্পনিক নারী চরিত্রের মুখে, আবার সেসব লেখার সমালোচনাও করেছেন অন্যের জবানিতে। তাঁর কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে কোনো পুরুষ চরিত্র না থাকার

কারণ হিসাবে নিজের অক্ষমতাকে দায়ী করার পাশাপাশি তিনি 'বন্ধুসভা'য় উপস্থিত তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরুষ-বন্ধু— শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, ভূমেন গুহ, জয় গোস্বামী প্রমুখর উদ্যোগী অংশগ্রহণকে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়েছেন। বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে ১৪ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত সমগ্র বইটি মানবী জীবনাশ্রিত বৃহত্তর সামাজিক জীবনকেও আলোকিত করে।

শব্দ ব্রহ্ম, কথোপকথন বা সংলাপ দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই দেখা যায় কথোপকথন, উক্তি-প্রত্যুক্তি, আড্ডা, সমালোচনা-পর্যালোচনা; নিজস্ব যুক্তি জাল বিস্তারের মাধ্যমে সুতপা ভট্টাচার্য তাত্ত্বিকভাবে ফেমিনিজমের বেড়াজাল টপকে নিজস্ব ঘরানায় নারীর সমস্যা ও সমাধানের নানান দিককে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই মাধ্যমেই এসেছে সমাজ জিজ্ঞাসা ও সামাজিক কাঠামো সমন্বিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— মেয়েদের বন্ধুত্ব, বিবাহ, পরিবার, স্বাধীনতা, যৌনমুক্তি, ভ্রূণহত্যা, অ্যাবরশন, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষা-শিল্প, ভাবনার বিন্যাসক্রম প্রভৃতি নানান দিক এবং এই আলোচনার শেষ আশ্রয় হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মল্লিকা সেনগুপ্ত-ও তাঁর 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' গ্রন্থে নারী সমস্যা সমন্বিত সামাজিক সমস্যার দিকগুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সুতপা ভট্টাচার্য বিষয়ের গাম্ভীর্যের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে তা যাতে কেজো কথার ঘেরাটোপে আটকে না থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়, সেই দিকটির প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি জানেন ও জানাতে চান সমাজের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নারী অবমাননার মতো একটি গভীর বিষয়কে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিরূপতা সহ্য করেই লিখতে হয় মেয়েদের। তাদের যে কোনো সৃষ্টিশীল রচনা বিশেষত কবিতা লেখার সামনে থাকে দ্বিবিধ-প্রতিবন্ধকতা— তার নিজস্ব আবেগ অনুভবের ভাষা সে পুরুষ রচিত ভাষার পরম্পরার মধ্যে খুঁজে পায় না, আর তার ঐকাত্ম্য-অর্জনের প্রয়াসের বিরোধিতা করে পুরুষ পোষিত সমাজ। এইসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে লিখতে হয় মেয়েদের। তার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।[১] লেখিকা সুতপা ভট্টাচার্য এই প্রস্তুতির ক্রমেই মেয়েলি সংলাপ গ্রন্থটি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নিয়েছেন বন্ধুতার নীতি।

প্রথম অধ্যায় 'পরিবার বিষয়ে একটি মেয়েলি দ্বিরালাপ', যেখানে প্রধানত এসেছে একান্নবর্তী পরিবারের প্রসঙ্গ, তুলি ও ঋতুর কথোপকথন এবং ঋতদীপার ডায়েরির মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে আরও একাধিক প্রসঙ্গ। পুরুষতন্ত্র ও ক্ষমতায়ণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। ঋতু বোঝাতে চায় 'সুখী পরিবারের সুখী বউ' হবার ইচ্ছেটা তৈরি হয়েছে পুরুষতন্ত্রেরই শিক্ষায়। পুরুষতন্ত্র তো এইটেই চায়, মেয়েরা সুখী বউ হয়ে খুশি থাকুক।[২] তথাকথিত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এই তন্ত্রের অংশীদার আবার চূড়ান্ত রক্ষণশীল নারী সমাজও। তবে নারীর জীবনকে সুখী তকমা দিয়ে তাকে গৃহবন্দি করে রাখার মানসিকতা থেকেই তাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে রাখার বাসনা। এর পশ্চাতে অবশ্য অর্থনীতিও ভীষণভাবে জড়িত। সাধারণভাবে মেয়েদের জীবনব্যাপী বা গড়পরতা আয় পুরুষের তুলনায় কম, কারণ হিসাবে অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার মনে করেন মেয়েরা মানবিক মূলধনে বিনিয়োগ কম করেন এবং তাদের জৈবিক অক্ষমতা এর জন্য দায়ী। তাই বাজারের চাহিদা ও জোগানের সূত্র অনুযায়ী তাঁরা কম মানবিক মূলধনের জন্য কম উৎপাদনশীল বলে কম মজুরি পাবেন, সুতরাং একজন সাধারণ মেয়ের বিবাহেই বেশি সুবিধা। আর স্বামীর আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তুলনামূলক সুবিধা আরও বাড়ে। বিপরীতে, অ-সাধারণ কোনও নারীর পুরুষের অভাব হবে না এবং তাঁর বিবাহে তুলনামূলক সুবিধা কমও হতে পারে।[৩] মূলত আর্থিক বৈষম্যের কারণে অধিকারবোধের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে, মানবিক দিকটি লঘু হয়ে যায়। আলোচ্য অধ্যায় অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিলীপ রায়কে বলা কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— "স্ত্রীকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি মনে করা অপরিসীম মূঢ়তা, আসলে মানুষকে দখল না করলে, তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব।"[৪] কিন্তু অর্থের বিনিময়ে পৃথিবী জুড়ে যে বৈষম্যের প্রবাহ বয়ে চলে,

তার সূত্রপাত হয় পরিবার থেকেই। তাই রাষ্ট্রতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের মতো পরিবার যতক্ষণ একটা ক্ষমতাতন্ত্র ততক্ষণ অধিকারবোধ এবং আধিপত্য একপক্ষের আর আনুগত্য আরেকপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এই হিসাবে পরিবারের সকল সদস্যের সহ্য ক্ষমতাও নির্ধারিত হয়। সেই সহ্যের সীমা লঙ্ঘিত হলেই একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন বা বিবাহবিচ্ছেদের মতো ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'মেয়েদের বন্ধুত্ব', যেখানে লেখিকা নানান পুরাণ প্রতিমা ব্যবহার করে মেয়েদের বন্ধুত্বের ধারাবাহিকতা ও বর্তমানে তাঁর প্রামানিকতা তুলে ধরেন। রাধার সখী ললিতা-বিশাখার, সতীর সখী জয়া-বিজয়া, সীতার সখী সরমা যেমন পুরাণক্রমে সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত তেমনই সাহিত্যে উল্লিখিত সখী সংবাদকেও প্রকাশের আলোয় এনেছেন। যেমন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবিত মৃত' গল্পে কাদম্বিনী বিশ্ব-সংসাররে কোথাও ঠাঁই না পেয়ে যোগমায়ার কাছেই গিয়েছে। নিরুপমা-অনুরূপা দেবী আর গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর বন্ধু হিসাবে মিলন হয় পরিণত বয়সে, ক্রমে তাঁরা হয়ে ওঠেন 'মনের আত্মীয়'। আসলে বন্দি জীবনে থেকেও যাদের মনের পরিসর বিস্তীর্ণ হয়, তাদেরই বন্ধুর জন্য আকুলতা দেখা যায়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমাজ নির্দিষ্ট নিয়মের কারণেই হয়ত পুরুষের অনেক বন্ধু থাকে, কিন্তু মেয়েদের 'জৈব জীবন' এর বাইরে কিছু নেই। দেরিদার 'Politics of Friendship' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নীটশের মতে ভালোবাসার ঠিকঠাক নামই বন্ধুত্ব— "This friendship is a species of love, but of a love more loving than love."[৫] মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার জন্য ও মানসিকতার আদানপ্রদানের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯ শতকে স্থাপন করেন 'সখী সমিতি'। এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে লেডিজ ক্লাব তৈরি হয়েছে, যারা নানান উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নবনীতা দেবসেন সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নাম দেন 'সই', যেখানে সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সম মানসিকতার মহিলারা খোলামেলাভাবে মনের আদানপ্রদানের সুযোগ পান। অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে মেয়েদের বন্ধুত্বের প্রবাহটিকে সংঘবদ্ধ ভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস থেকে নারীর নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার পথ আরো সুগম হবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'বিবাহের বিরুদ্ধে'। বিবাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল বিশেষভাবে বহন করা (সং , বি + বহ্ + অ)। সামাজিক অর্থে বিবাহকে যদি এক ধরনের চুক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বিবাহ হল যে কোন ধর্মের ধর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হওয়া একধরণের চুক্তি বা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার কর্তা, কোর্টের রেজিস্টার দ্বারা সম্পাদিত পারস্পরিক একটি চুক্তি আবার দু'জন মানুষের মাঝে শুধুমাত্র ভালোবাসার চুক্তি হতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রে আট ধরনের বিয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ।[৬] নিয়তির আকর্ষণে নারী এবং পুরুষ পরস্পরকে ভালবাসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতি প্রযুক্তিবিদ্যার কারণে পৃথিবী জুড়ে নারী পুরুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রা ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। ১৯২৭ সালের কাউন্ট কাইজারলিং 'Book of Marriage' বইটিতে বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে সংকটমুক্ত করতে একাধিক প্রবন্ধে দেখান বিবাহ প্রতিষ্ঠান পুরনো ধাঁচে না টেকার কারণগুলি। ইউরোপ-আমেরিকা আলোচ্য হলেও আজকের দিনে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ যুক্ত হয়েছে।[৭] এর জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র। গৌতম ঘোষ 'দখল' সিনেমায় দেখান, ১২ বছর ঘরকান্না করার পর কৃষক দম্পতির পুরুষটি মারা গেলে নারীকে ক্ষমতাবান জোতদার জমি থেকে উৎখাত করে এই কথা রটিয়ে যে, দম্পতির নাকি বিয়েই হয়নি। বোঝা যায় সম্পত্তির মালিকানা জড়িত স্বার্থপর প্রতিষ্ঠান কীভাবে একসূত্রে গেঁথে যাচ্ছে। 'পাত্রী চাই' বা 'Matrimony.com'— এর বিজ্ঞাপনে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্মার্ট-সুন্দরী-কনভেন্ট এডুকেশনের চাহিদা বাড়ছে আর এক বিবাহের পরিবর্তে বহু পুরুষ বিবাহ, বহুনারী বিবাহ, বহুপার্শিক বিবাহ, সমলৈঙ্গিক

বিবাহ গুরুত্ব পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে 'লিভ টুগেদার'-এর কনসেপ্ট-ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহের ক্ষেত্রে 'মঙ্গল-অমঙ্গলের' ধারণা দেখান, যা 'যোগাযোগ' পরবর্তী উপন্যাসে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রকৃত প্রণয়ের' উল্লেখে বিবাহ সম্পর্ক নির্দেশে নারী পুরুষের যৌনমুক্তির কথা বলতে চেয়েছেন, যাকে সমর্থন করেন সুতপা ভট্টাচার্য নিজেও। এই পদ্ধতিতেই তিনি মনে করেন, বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি মানবিকতা যুক্ত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়টি হল 'নারীমুক্তি আর যৌনমুক্তি'। ফেমিনিজমের সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক-সমাজতান্ত্রিক-যুক্তিবাদী ধারণা স্পষ্ট। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে পিতৃতন্ত্রের মতো মূল ক্ষমতা কাঠামো। নারীবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে বিপুল সাড়া জাগানো বইগুলি হল— এঙ্গেলেসের 'The origin of family, private property and the state' (১৮৮৪), ভার্জিনিয়া উলফ-এর 'A room of one's own' (১৯২৯), সিমোন দ্য বোভোয়ার 'The second sex' (১৯৪৯), কেট মিলেটের 'sexual politics' (১৯৭০) এবং হুদা শারাবীর স্মৃতিকথা। নানান পর্যালোচনা ও সমাজের ভূমিকার পরিণতি হিসেবে দেখা যায়, যৌনতা— যা দুটি মানুষের সর্বাঙ্গ মিলনের পরিণতি, তার মধ্যেও এসে পড়ে সমাজ আর সমাজ নিষিদ্ধতার নানা যুক্তি। সিমোন-দ্য-বোভোয়ার এই পরিস্থিতিতেই হয়তো বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে'। বোঝা যায়, যৌনতা আসলে একটি সামাজিক সম্পর্ক। পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষ নারীকে সবচেয়ে বড় যে ধাপ্পাটি দিয়েছে তার নাম মনোগ্যামি। অর্থাৎ, এক নারী এক পুরুষের যৌননিষ্ঠার ব্যবস্থা যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আধুনিক পরিবার। কিন্তু পুরুষ কোনও দিনই এই যৌননিষ্ঠা পালন করেনি। আগে পরিবার ছিল বহুপত্নিক, অর্থাৎ যৌন একনিষ্ঠতার দায় শুধু মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৮] তাই নারী মুক্তির জন্য যৌনতার সঙ্গে আরও কতগুলি বিষয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন— সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, আত্মবিশ্বাসের সুযোগ প্রভৃতি। এই গণ্ডিগুলি অতিক্রম করতে পারলে হয়তো নারী তার নিজস্ব বিকাশের আকাশ খুঁজে পেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'স্ত্রী-র স্বাধীনতা থেকে নারীমুক্তি মেয়েদের চোখে'। স্বাধীনতা হীনতা তথা পরাধীনতার আক্ষেপ ১৯ শতকে বাঙালি নারীদের কলমে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৬৯ সালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বামাসুন্দরী দেবী পরাধীনতার কষ্টের জন্য আক্ষেপ করেন, কারণ— পথে নারী বিবর্জিতা, দেশভ্রমণে মেয়েদের অধিকার নেই। মায়াসুন্দরী দেখান, চার দেওয়ালে বন্দি মেয়েদের ভিতরকার গোমড়ানো কান্না— হাওড়া ব্রিজ নির্মাণের সময় কলকাতাবাসী পুরুষদের তা দেখার অধিকার থাকলেও মেয়েদের ছিল না। প্রসন্নবালা গুপ্তর ১৯৮৭ সালে 'বামাবোধিনী' তে সমানাধিকারের দাবিতে ক্ষোভ নয়, আক্ষেপ প্রকাশ পায়। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী-ও মেয়েদের জীবনকে কারাগার তুল্য অবস্থান থেকে দেখান। ক্রমে উপনিবেশিক ও পুরুষতান্ত্রিক পরাধীনতা সম্পর্কে মেয়েরা সচেতন হয়ে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবী সৃষ্ট সুবর্ণলতা চরিত্র অসহযোগ আন্দোলনে বিলিতি কাপড় পোড়ায়, সুলেখার সান্যালের নায়িকা ঠাকুরদার মার খেয়েও রিলিফের কাজে যোগ দেয়। সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' বা 'পাকা ধানের গান' রাজনৈতিক সংগ্রামের গল্প হয়ে ওঠে। সাংসারিক ভূমিকা পালনের বাইরে গিয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তার খোঁজকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র'-গল্পের মৃণাল মুক্তি বলে জেনেছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া ব্যাকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে এক নারী নেত্রীর, যিনি সংসারকে দেখিয়ে দেবেন নারী শুধু খেলনা নয়, উপকরণ নয় সংসারের, এক সম্পূর্ণ মানুষ। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশি মা' ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসগুলিতেও পিঞ্জরাবদ্ধ নারীর মুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে। তসলিমা নাসরিন 'আমার মেয়েবেলা' সহ অন্যান্য উপন্যাসে সামাজিক নানান অসংলগ্নতার প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়টির

শেষে শোনা যায় উশ্রীর গাওয়া গান— 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। রবি ঠাকুরের গানের কথার রেশ ধরেই মনে হয়, আত্মনির্ভরতার শক্তিই পারে মেয়েদের আলোর দিশা দেখাতে, তাদের আলোকিত পথের দিকে এগিয়ে দিতে। আগামী দিনের মেয়েরা সেই ভরসাতেই পথ হাঁটবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'ভ্রূণহত্যা'। এই শব্দবন্ধর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইহজগতের যাবতীয় আবেগ। যে আগত প্রাণ পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাকে অকালে নারকীয় সামাজিক হত্যার সম্মুখীন করা হয়, তার জন্মের আগে থেকেই। আজকের দিনে মহিলারা শত কষ্ট বুকে চেপে রেখে পারিবারিক বা পেশাগত কারণে অ্যাবরশন করাতে বাধ্য হন। আলোচ্য অধ্যায়টি জুড়ে রয়েছে মিনু নামের এক নারীর গল্প, যার সন্তান ধারণ-পালন বা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেয়নি স্বামী সহ সমগ্র পরিবার। অল্প বয়সে বিয়ের পর প্রথম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা কালীন পড়ে যাবার ফলে অ্যাবরশন করাতে চাইলে প্রবল বাধা আসে পরিবারের পক্ষ থেকে। অশক্ত পুত্র সন্তানকে বুকে জড়িয়ে লালন পালন করার দুই বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে কন্যা জন্ম দেওয়ার কারণে আবারো লাঞ্ছিত হতে হয়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে অসুস্থ পুত্র সন্তান মারা গেলে সমস্ত দায় বর্তায় মিনুর ওপর, পাশাপাশি চলতে থাকে অসুস্থ স্বামীর সেবা। মিনু চায় কন্যা সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে মুক্ত আকাশ দিতে। কিন্তু পারিবারিক ঔদাসীন্যে মারাত্মক ক্ষয় রোগে ঝরে যায় মিনুর জীবন। আবার মিসেস সেন দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে নিজের প্রাত্যহিক জীবন ও ক্যারিয়ারের কথা ভেবে অ্যাবরশনকে প্রাধান্য দেয়। সে অনুভব করে দাম্পত্যের কেন্দ্র ভূমিতে মেয়েদের ভূমিকা পরোক্ষ আর বিয়ে আসলে 'লিগালাইশড প্রস্টিটিউশন'। একথা স্বীকার্য যে, নারী স্বাধীনতার সঙ্গে নারীর আইনগত অধিকার প্রসঙ্গে পারিবারিক-সামাজিক ও মাতৃত্বকেন্দ্রিক স্বীকৃতিগুলিকে গ্রহণযোগ্যতা দেবার সময় এসে গেছে। মাতৃত্বকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি অবশ্যই নারীর প্রজননের ক্ষেত্রে নিজস্ব জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মত গর্ভপাত আইন (Medical Termination of pregnancy) মেয়েদের সুরক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকায় মেয়েরা অনেক সময় সহজলভ্য কোন প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়। এই 'MTP' আইন ভারতে ১৯৭১ সালে বলবৎ হয়, ২০০৩ সালে তার নারীর অধিকারের মধ্যে আসে আর ২০২১ সালে ২০ সপ্তাহের বদলে ২৪ সপ্তাহ অ্যাবরশন নিয়মের আওতাভুক্ত হয়।[৯] বাস্তবিক ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা মহাভারতের যুগ থেকে নারীর উপর যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এসেছে নারী সুরক্ষার এই আইনগুলি ব্যথা ভরা হৃদয়েও নারীকে আরো দৃঢ়চেতা করে তাকে মুক্ত আকাশের সন্ধান দিয়েছে।

'নারীশক্তি' নামক সপ্তম অধ্যায়টি শুরু হয়েছে দ্যুতির কথা দিয়ে। ক্রমে রোচনা, শ্রুতি, উশ্রী ও ঋতদীপার কথোপকথনে উঠে আসে বাস্তবে-সাহিত্যে-শিল্পে নারীর অবস্থান, ও আত্মসন্ধানের নানান দিক। রুশতী সেনের 'পরানের আলো ভুবনের আঁধার', 'মায়েদের কথা মেয়েদের কথা' বই বা শ্যাম বেনেগালের সিনেমা— সর্বত্রই নারী লাঞ্ছনার হৃদয় বিদারক ছবি স্পষ্ট হয়। সমাজের হাতে প্রতিদিন মার খাওয়া মেয়েদের সমস্ত মানসিক শক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠেন দেবী সরস্বতী। পুরান মতে অসুরের রক্ত থেকে জাত অসংখ্য অসুরকে শায়েস্তা করেন শক্তিরূপিনী দেবীর সঙ্গে চৌষট্টি যোগীনিও। নবজাগরণের কালে মধুসূদন দত্তের লেখা 'বীরঙ্গনা' কাব্যের প্রেম ও প্রতিবাদ মিশ্রিত পত্রগুলি নারী শক্তির অন্যতম আকর। বর্তমানে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও সামাজিক পদে নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো নারকীয় ঘটনাগুলিও দীর্ঘকাল যাবত আমাদের অস্তিত্বে নাড়া দিয়ে যায়। মাতৃত্বের উপরে পুরুষতন্ত্রের সবচেয়ে বড় আঘাত হল গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যা ভ্রূণগুলির গর্ভপাত ঘটানো। 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে

ভার্যা'— এই সনাতনী মনোভাবটি কন্যা সন্তানকে আপদ রূপে চিহ্নিত করে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার পাশাপাশি গর্ভবতী মায়ের কন্যা ভ্রূণ হত্যার নারকীয় উল্লাস সহ পিতৃতান্ত্রিক উগ্রতার বীভৎস রূপ। লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হয়ে চলা আন্দোলনের নেত্রী মালিনী ভট্টাচার্যের ভাষায়— "পুত্র এষনা / কন্যা এসো না।"[১০] পুত্রেষণার মতো সামাজিক মনোবৃত্তির সঙ্গে লিঙ্গ নির্ধারণের মতো আধুনিকতম প্রযুক্তি সংযুক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলের মানুষকে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচার আরো দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত হচ্ছে। এই অন্ধকার পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আলোর দিশা দেখানোই একজন সচেতন নাগরিকের আশু কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া কাম্য।

অষ্টম অধ্যায়ের নাম 'যৌনতা বনাম সংস্কৃতি: তসলিমা নাসরিন'। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের নারী হয়েও পুরুষতন্ত্রের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্যক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন তার 'আমার মেয়েবেলা', 'দ্বিখণ্ডিত', 'নির্বাচিত কলাম' সহ অন্যান্য সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে। আমাদের দৈনন্দিন সংস্কৃতি বা জীবনের যে নির্মিতিগুলি অনবরত নারীকে পুরুষের ব্যবহার্য যৌনবস্তুতে পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদনের বিষয়ে পরিণত করেছে, নারীকে বন্দি রাখার অদৃশ্য পিঞ্জরের শলাকায় গেঁথে রেখেছে, সেই বন্ধনের স্বরূপ যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি। তবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ধর্মের বিধানানুযায়ী নারীকে অবদমিত রাখার কৌশলের কথা তসলিমার আগে বেগম রোকেয়া বা জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো নারীরা বলেছিলেন। তসলিমার প্রতিবাদ সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ রাজনীতির বিরুদ্ধে।[১১] 'স্ত্রৈণ' চিহ্নিত হওয়ার অগৌরব থেকে বাঁচতে পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে সন্তান পালনকে 'মেয়েলি কাজ' বলে চিহ্নিত করে থাকে, আবার যৌনতার ক্ষেত্রে অবদমিত রাখার জন্য 'দেবী', 'সতী', 'লক্ষী' , 'ফুল'— এর সঙ্গেও তুলনা করে থাকে। তসলিমা মেয়েলি শব্দটির পরিবর্তে 'নারীত্ব' এবং ছেলেবেলা শব্দটির পরিবর্তে 'মেয়েবেলা' ব্যবহার করে নারীর সাংস্কৃতিক উত্তোরণের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে চেয়েছেন। তবে 'ছেলেবেলা' শব্দবন্ধে শৈশবের যে আবেগ লুকিয়ে থাকে, সেই প্রেক্ষিতে 'মেয়েবেলা' শব্দবন্ধটি অনেকটাই এক পেশে বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক সুতপা ভট্টাচার্য। আবার মল্লিকা সেনগুপ্ত মনে করেন, সংবিধান অনুযায়ী সমানাধিকার নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। নারীকে দেবী ভাবাটা যেমন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী একটা বিশাল ধাপ্পা তেমনি ধর্মের ভিত্তিতে নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা পুরুষতান্ত্রিক চতুরতা বা ধৃষ্টতা। কেননা হিন্দু আইন যদি পূর্বপুরুষের সম্পত্তির সমান অংশ মেয়েকে না দেয়, মুসলিম আইন যদি নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকার না দেয়, খ্রিস্টান আইন যদি যৌন আচরণের ক্ষেত্রে দুমুখো নীতি চালু রাখে, সেক্ষেত্রে সংবিধান নিরুপায়, রাষ্ট্র ঠুঁটো। কারণ তারা ধর্মের স্বাধীনতায় হাত দেবে না।[১২] তসলিমার প্রতিবাদ ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে। পরিবারের পুরুষেরা মুসলিম নারীর উপর যে যৌন অত্যাচার করে, ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে অনুভব করে গর্জে উঠেছিলেন তসলিমা, যা প্রকাশ্যে মানতে পারেনি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ, কঠোর হয় রাষ্ট্রনীতি, তসলিমার উপর তীব্র হয় আঘাত, দেশ ছাড়া করা হয় তাকে। পুরুষের ভালোবাসার নামে যৌন অত্যাচার বা ধর্ষণ আজও সমাজের জীবন্ত সমস্যা। 'শুভ বিবাহ' নামক কবিতায় তাই তসলিমা বলেন— 'আমার জীবন / চর দখলের মতো দখল করেছে এক বিকট পুরুষ/ আমার শরীর চেয়েছে সে নিজের অধীন।'

নবম অধ্যায়ের নাম 'মেয়েদের বিকল্প ঐতিহ্য'। আগের অধ্যায়ে তসলিমা নাসরিনের পুরুষতন্ত্রের কদাচার-এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্য মনে করাতে চান পাকিস্তানের সাতজন মহিলা কবির পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার কবিতাগুলিকে। পুরুষ প্রতাপী সমাজে নারীরা চিরকালই

অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে নিজের সত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু থেকেছে, সৃষ্টির প্রথম লগ্নের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত করতে চেয়েছে নিজের আত্মপরিচয়, জানাতে চেয়েছে 'আমার ব্যক্তিতা নিছক তোমার লালসার প্রতীক নয়'।[১৩] আত্মানুসন্ধানের সূত্রেই রুকসানা আহমেদ 'we singful woman' বা 'আমরা গুন্‌হগার মেয়েমানুষ' নামে সংকলনটিতে পাকিস্তানের সাতজন মহিলা কবিদের কবিতার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এখানে নারীবাদ যেন প্রতিবাদের আরেক নাম। এই কবিরা জানেন, রাষ্ট্রপ্রতাপ আর ধর্মপ্রতাপ যখন একযোগে পুরুষতন্ত্রের আশ্রয়ে লালিত হয়, তখন প্রতিবাদের কবিতাই মেয়েদের পরিত্রাণের একমাত্র আশ্রয়। মার্কসবাদীরা দেখিয়েছেন, স্বাভাবিক কোনো কারণবশত নয়, স্রেফ অর্থনৈতিক কারণের জন্য অর্থাৎ আদিম যুগের স্বাভাবিক ও যৌথ ধনসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের জয়লাভকে ভিত্তি করে, তারই প্রথম অভিব্যক্তিরূপে এই পারিবারিক প্রথা উদ্ভূত হয়। পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য একমাত্র তারই ঔরসজাত সন্তান প্রজনন— একনিষ্ঠ বিবাহের যে এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য, গ্রীকরা তা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করে। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলির ক্ষেত্রে বিবাহ বোঝার মতোই গণ্য হত। এ ছিল দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের কাছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।[১৪] শুধু গ্রীকরা নন, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতাও পুরুষতন্ত্রের এই বিধিকে মান্যতা দিয়েছেন। সুতরাং, এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী সরব হবে, এটাই স্বাভাবিক, ওই মাধ্যমেই নারীরা ঐকাত্ম্যের সন্ধান করেছেন। 'বিকল্প সাহিত্য-ঐতিহ্যের সন্ধানে' নামক শিরোনামে লেখিকা দেখান মেয়েদের লেখা মানেই মেয়েলি নয়। অ্যালিস ওয়াকারের 'In search of our mother's Gardens' বইয়ের 'মেয়েলি গদ্য' (womanist prose) এর 'মেয়েলি' শব্দ প্রসঙ্গে বলা আছে— সেই মেয়েকে বলা যায় মেয়েলি, যে ভালোবাসে অন্য মেয়েদের, মেয়েদের সংস্কৃতি-আবেগ-কান্না ও তার সামর্থ্য। কখনো বা ব্যক্তিগত ভাবে কোনো পুরুষকে ভালোবাসে, আর সে দায়বদ্ধ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য, তাদের সম্পূর্ণতার জন্য। সে কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, সে হল বিশ্বমানবিক। সুদূরপ্রসারী আলোর অভিমুখী এই মানসিকতা শুধু মেয়েদের নয়, মানুষের জীবন ও সাহিত্যের অভিমুখ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দশম অধ্যায় হল 'রাজনীতি ও মেয়েরা'। মল্লিকা সেনগুপ্ত 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কবিতায় দেখিয়েছিলেন ইতিহাস মানে 'His' স্টোরি, 'Her' এর অংশগ্রহণ সেখানে বিলুপ্তপ্রায়, আর সুতপা ভট্টাচার্য দেখালেন ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরলে দেখা যায় রাজনীতিতে চিরকালই পুরুষের অংশগ্রহণ বেশি ছিল, নারীরা পর্দার আড়ালে থেকে পুরুষের অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছে। তাই প্রাচীনকাল থেকে রাজনীতিতে ছিল পুরুষের ঘোষিত দাপট, ক্রমে মেয়েরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে বুঝেছে, নারীর অন্তরাত্মায় লালিত থাকে রাজনীতি। উনিশ শতক পর্যন্ত পর্দানসীন থেকে বিশ শতকের শুরুতে সচেতন মেয়েরা বুঝতে পেরেছে, পিতা স্বামী বা সন্তানের অধীনতা নয়, সম্পত্তির ক্ষেত্রে তারও মালিকানা থাকা প্রযোজ্য। ফলত সমাজ বাধ্য হয় একপেশে মনোভাব থেকে সরে আসতে, কার্যকরী হয় আইন অনুযায়ী নীতি প্রয়োগ, নারীর সম্পত্তির অধিকার আইন ও ধর্ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। হিন্দু আইনে ১৯৫৬ সালের পর কন্যাদের পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন প্রযুক্ত হয়েছে, আর মুসলিম নারীরা এক্ষেত্রে সম্পত্তির কিছু শেয়ার লাভ করে। ক্রমে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পঞ্চায়েত-রাজ্যসভা-বিধানসভা-লোকসভাতে মেয়েরা নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে অংশগ্রহণ করে। নারীকে পুতুল করে রাখার কায়েমী স্বার্থ নির্ভর পুরুষতন্ত্রের অভিসন্ধির গোড়ায় আসলে আর্থিক ও সামাজিকতা নির্ভর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। কৃষ্ণভাবিনী দাস 'ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা' নামক গ্রন্থে ইংল্যান্ডের স্বাধীন মেয়েদের দেখে স্বদেশীয় পরাধীন মেয়েদের দুঃখময় জীবনের কথা স্মরণ করে উচ্চশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে

চেয়েছিলেন। নারীর সর্বতোভাবে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য হয় ১৯৫০ সালে গৃহীত হওয়া ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ভোটাধিকার আইন, যেখানে নির্ধারিত হয় পুরুষের মতো ১৮ বছরের ঊর্ধ্বের প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরাও ভোট দিতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান সমাজ ও রাজনীতি স্বীকৃত সফল পদক্ষেপ হলেও এই জয় সহজে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো স্থিতধী পুরুষ মনে করেছিলেন, বিপ্লব নারীকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। তবে পরবর্তীকালে যন্ত্র নির্ভর অমানবিক সভ্যতার আস্ফালন দেখে তিনি প্রমাণ করেছিলেন সমাজে শ্রী ও মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে নারীর ভূমিকাও কম নয়, লিঙ্গ রাজনীতি আর রাষ্ট্র রাজনীতি পেরিয়ে সদর অন্তরে বিরোধ ঘোচাতে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী যেমন 'দ্রৌপদী' গল্পে রাষ্ট্ররক্ষীদের নগ্ন রূপ দেখিয়েছিলেন, তেমনি আশাপূর্ণা দেবী তার 'ট্রিলজি'তে— (প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা) দেখাতে চেয়েছেন অন্দর থেকে বাইরে আসার পর্যায়ক্রমে সামাজিক পরিকাঠামো ও রাষ্ট্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন আছে। এই অধ্যায়ের শেষে ঋতদীপার ডায়েরি অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সমস্ত 'বাঁধন' ছিন্ন করে নারীকেই যে এগিয়ে আসতে হবে, এমনই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়।

একাদশ অধ্যায়ের নাম 'নারীর ক্ষমতায়ন'। যুগে যুগে নারীর স্বাধিকারের প্রসঙ্গে ক্ষমতায়নের বিষয়টি সমান্তরালে এগিয়ে চলেছে। লেখিকা দেখান অধিকার অর্জনের প্রথম শর্ত ছিল পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাচাপের স্বরূপ বুঝে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাতে দেখিয়েছিলেন ঘরে কাজ করা 'শান্ত মেয়ে'কে সবাই বলে 'ভালো'। এও ঠিক 'ভালো'র কোনো শেষ নেই। তাই ক্ষমতায়নের প্রথম পদক্ষেপ হল পুরুষতন্ত্র নির্দেশিত রোল মডেলকে প্রত্যাখ্যান করে সংসার থেকে বেরিয়ে বাইরের কাজে-দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া। শাস্ত্র অনুযায়ী 'স্বামী সেবা' থেকে কিছুটা সরে এসে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারলেও মেয়েরা সামাজিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে পারে। প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে যুগে যুগে নারী অবমাননা দেখা গেছে— পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চিরকালই মনে মনে শরীরে স্ত্রী লিঙ্গকে অপমান করে এসেছে। তার মধ্যেই সোচ্চার প্রতিবাদে ব্রহ্মবাদিনী বেদকন্যা অপালা, ঘোষা, সূর্যা, রেমিশা, বিশ্ববারা, সরমা-রা উঠে দাঁড়ান বেদমন্ত্রে। বেদোত্তর কালেও গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাৎসী, বাক্‌ঋষিকা-রা বজ্রনির্ঘোষে জানিয়ে দেন সমাজে নারীর স্থান তুল্যমূল্যে সমানাধিকারে।[১৫] যতই দিন বদলের পালা আসুক এ প্রমাণিত যে 'বিবাহ'ই হল ব্যক্তিগত ক্ষমতাচাপ প্রয়োগের এক ক্ষমতাতন্ত্র, যা ঐতিহ্য অনুসারী বৈষম্যমূলক নীতি নিয়মকেও অগ্রাধিকার দেয়। প্রাগৈতিহাসিক কালে মাতৃ পরিচয় ছিল সন্তানের পরিচয়। তখন একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাঝে বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক দুটোই ভিন্ন বিষয় ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা সামাজিকভাবে একক দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করে, যার সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থনীতি। একক দাম্পত্য জীবনে নারী ক্রমাগত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির অন্তঃপুরে একজন ক্রীতদাসীর ভূমিকা পালন করা আরম্ভ করে। দার্শনিক মিল্ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন— 'No slave is a slave to the same as wife'। এঙ্গেলস এর ব্যাখ্যায়—

> "The wife becomes the first domestic servent pushed out of participation in social production. The modern individual family is based on the open or disguised enslavement of the woman."[১৬]

নারীকে কৌশলে করায়ত্ত করে নিজের সুবিধাজনক অভিরুচি ও অভিপ্রায়ে পুরুষতন্ত্র তাকে 'সুন্দর' তকমা দেয়। কিন্তু আত্মসচেতন মেয়ে তার বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেকে প্রমাণ করে। মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে বিশ্বকবি-ও দোলচলতায় ছিলেন। নারীর এই ক্ষমতায়নের পথে তার সবচেয়ে বড় বাধা

হল তার শরীর ও যৌনতা। তবে এই বাধা গণ্ডিকে পেরিয়ে আজকের দিনে নারী সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে। বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'-তে যে স্বপ্ন রাজ্যে সুলতানা ভ্রমণ করে, সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' বা সাবিত্রী রায়ের 'মেঘনা-পদ্মা'র মতো উপন্যাসে যেভাবে বালিকা প্রটাগনিস্টরা উঠে আসে, বা আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্ররা যেভাবে নিজেদের মতন করে প্রতিবাদে সামিল হয়, বর্তমানের নারীরা তাদেরই আলোকবর্তিতা বহন করে যথার্থ কর্মে ও মানবিক ধর্মে। সেকারণেই আজকের দিনে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে শ্রমের হায়ারারকি, মুছে যাচ্ছে ঘর বাহিরের দ্বিবিভাজন। নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে ১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষে তৈরি হয় বেশ কিছু আইন— হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬), দেহ নিয়ে অবৈধ কারবার নিবারণ আইন (১৯৫৬), সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন (১৯৮৭), ভ্রূণ হত্যা নিবারণ আইন (১৯৯৪), মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা আইন (১৯৬১), যৌতুক নিষিদ্ধ আইন (১৯৬১), ও ঘরোয়া হিংসার বিরুদ্ধে মহিলা সুরক্ষা আইন (২০০৫)। শুধু আইনের ঘেরাটোপে থাকলেই হবে না, মানসিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিলেই সমাজ আধুনিক ও লিঙ্গ বৈষম্যহীন হবে। কোলরিজের মহৎ মনকে উভলিঙ্গের তকমা দেবার মতো সমাজ মন-ও উভলিঙ্গ হবে। তবেই 'আগুনের পরশমণি' ছুঁইয়ে আমরা সেই আলোকসন্ধানী হতে পারব, যেখানে জোরের সঙ্গে বলা যায়— 'There is something more important— to be human.' ঋতদীপার ডায়েরি অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের অন্য নাম হোক 'Humanity' বা মানবিকতা।

'নারী ও ধর্ম' নামে দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বা পুরুষতন্ত্রের কদর্যতাকে জিইয়ে রাখার অন্যতম উপাদান হিসেবে ধর্ম কত ভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ধর্মের ভয় দেখিয়ে মেয়েদের ঘোমটা বা বোরখার আড়ালে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে আজীবন। আবার দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থসিদ্ধি করেছে মুনাফা লোভী রাজনৈতিক মদতদুষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। নারীর ক্ষেত্রে সতী হওয়া থেকে ব্রতকথা পালন— সব ক্ষেত্রেই সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে পুরুষতান্ত্রিক শাসনের কঠোরতা। 'সতীমন্দির' নামক ধর্মীয় পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বারে বারে নারীকে সতী হতে বাধ্য করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের সতী হওয়া নিয়ে দেশজোড়া তোলপাড়ের পর মধ্যপ্রদেশের কুট্টুবাই এর সতী হওয়ার ঘটনায় উত্তাল হয়েছে সারা দেশ। ধর্মের আইন কানুন যে মেয়েদের পদানত রাখার জন্যই তৈরি হয়েছিল, তা আজকের দিনে প্রমাণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত। তাই অনিন্দিতা দেবী তীব্র বেদনায় লিখেছিলেন— 'হায় ধর্ম, তোমারই বা এ কি অধর্ম'। রামমোহন রায় ১৯ শতকের গোড়াতেই যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হয় না, নানা উপায় জোর করে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হয়।[১৭] এই সত্যকে আড়াল করে ধর্মমাদকতা পুষ্ট সমাজ দেখাতে চায়, সতী হওয়া হত্যা নয়, আত্মহত্যা। মেয়েদেরই চিহ্নিত করা হয় কখনো দেবী বা কখনো 'বাজারের মেয়ে' তকমায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রতকথা' প্রবন্ধতেও দেখান, ব্রত যেমন একাধারে শিল্পের অঙ্গ, তেমনি সতীন সমস্যার মতো বিকৃত রূপও ব্রতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। ঈশ্বর উপলব্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের বিস্তারে দেখা যায় পুরুষের আধিপত্য আর ধর্ম যেখানে ক্ষমতাতন্ত্র, সেখানে পুরুষতন্ত্র নারীকে চিহ্নিত করে 'নরকের দ্বার' হিসাবে এবং নারী ও শূদ্র সেখানে সমানভাবে পোষিত। লক্ষ্মীমণি দেবী বা মধুমতি গঙ্গোপাধ্যায় দেখান, নারীর এই অবস্থার প্রধান কারণ অশিক্ষা। উপেন্দ্রমোহিনী দেবী নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছেন। সুবাসিনী সেহানবীশ ধর্মাচরণ ও জ্ঞানোপার্জন উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের দাবি জানান। ধর্মের নামে একাদশীর দিন উপোসী বিধবাকে এক বিন্দু জল এর অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এই জঘন্য প্রথাটিকে সাবিত্রী রায় 'পাকা ধানের গান'— এর

আন্নার মাধ্যমে দেখান, একাদশীর দিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে যে দু'ঢোঁক জল খাবার অপরাধে সমাজের তাড়নায় আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়। উনিশ শতকের লেখিকারা ধর্মের কদর্য প্রথাকে 'দেশাচার' বলে চিহ্নিত করে সমস্যাগুলিকে তুলে ধরার প্রয়াস রাখলেও হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের কারণে প্রতিবাদী হতে পারেননি। বিশ শতকের গোড়ায় এই প্রতিবাদকে প্রথম ভাষা দিলেন বেগম রোকেয়া। হিন্দু জাতীয়তাবোধের চাপ তার ওপর না থাকা বা মুসলমান জাতিত্ববোধের উগ্রতা ততটা না থাকার কারণে তিনি ১৯০৩ সাল নাগাদ শাস্ত্রের বচনকে প্রতিবাদী মেয়ের উপর 'অস্ত্রাঘাত' হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় মৌলবাদ বা মুসলিম মেয়েদের উপর হওয়া তালিবানি হুকুমনামার বিরুদ্ধ প্রতিবাদী ছিলেন তিনি। ১৯২১ সাল নাগাদ জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার মাধ্যমে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রখর প্রতিবাদ আরো জোরালো হয়। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীর পত্র'র মতো গল্প বা 'চতুরঙ্গ' মত উপন্যাসে মৃণাল ও দামিনী চরিত্রের মাধ্যমে নারীর প্রতিবাদী সত্তাকে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রতিবাদ নির্দিষ্ট ছিল পুরুষের ধর্মভাবনায়। মেয়েদের সম্মানহীনতার কারণে, সেই অপমানের জ্বালাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'নারীর কথা'তে। আবার রমলা বসু 'নারীর দেবীত্ব' নামক লেখায় দেখালেন, মেয়েদের উপর দেবীত্বের আরোপ পুরুষের স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়ে সমগ্র স্ত্রী জাতিকে প্রবঞ্চিত করারই বিশেষ কৌশল। লেখনীর মাধ্যমে সমাজের মুখোশ খুলে দেওয়া সে যুগের নারীরা দেখাতে পেরেছিলেন, 'Ideal'-এর তকমা দিয়ে নারীকে কীভাবে 'Real' বা বাস্তব সত্য থেকে কৌশলে সরিয়ে রাখা হয়। মীরাতুন নাহার ও সুকুমারী ভট্টাচার্য কোরান-হাদিস বা উপনিষদ-ব্রাহ্মণের সূত্র অবলম্বন করে দেখিয়েছিলেন, ধর্ম কীভাবে নারীকে 'অশুচি, স্বভাব পাপিষ্ঠা, অমঙ্গলের হেতু' তকমা দিয়ে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বর্ণভিত্তিক কর্মসন্ধান থেকেও নারীকে বঞ্চিত রেখে যে কোনো ধর্ম গুরুত্ব দিয়েছে স্বামী সেবাকে। সুতপা ভট্টাচার্য এই অধ্যায়ে তথ্যসূত্রের উল্লেখে ও প্রমাণ সাপেক্ষ বক্তব্যের সাবলীলতায় দেখিয়েছেন ধর্ম কত পদ্ধতি ও প্রকারে নারীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঙ্কিত হয়েছে 'বাঙালি মেয়ের শিক্ষা সামর্থ্যের মানচিত্র'। সমাজ নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী নারীর ক্ষেত্রে ধ্যান-জ্ঞান কর্ম ছিল স্বামীসেবা। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নারীরা স্বামীকেই দেবতা হিসেবে মান্যতা দিতে বাধ্য থাকত। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য দেবতাদের সভায় নৃত্য করেছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের দুই পত্নী কানড়া ও কলিঙ্গা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যা মেয়েদের পেলব ধারার বিপরীতের সামর্থ্যকে চিহ্নিত করে। ত্রিপুরাসুন্দরী রানীও গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মধ্যযুগের রূপকথায় মেয়েদের শিক্ষা সামর্থ্যের যে সমস্ত চিত্র ছড়িয়ে আছে তার বেশিরভাগটাই মৌখিক। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে যে সমস্ত ধর্মের অভ্যুত্থান আমাদের দেশে হয়েছিল, সেখানে ছিল মেয়েদের শিক্ষার অধিকার। থেরিগাথা রচয়িতা ভিক্ষু নারী যেমন তাদের কাব্য রচনার পরিচয় রেখে গেছেন, তেমনি বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান সহজযান সাধনার চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে কয়েকজন মহিলা-ও ছিলেন। এরা হলেন— মনিভদ্রর দুই বোন মেখলি এবং কঙ্গলা আর ইন্দ্রভূতির বোন লক্ষ্মীঙ্করা। [১৮] পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরোধিতা করলে বৈষ্ণব ধর্ম মেয়েদের শিক্ষার স্বীকৃতি দেয়। মৌখিক ঐতিহ্য রচনায় মেয়েদের বিশেষ সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মেয়েলি ভাষায় মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গিতে' রচিত ব্রতকথায় নারীর কামনা-বাসনা অবাঞ্ছিত থাকার অবদমিত যন্ত্রণার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষারও সম্যক রূপায়ণ হয়েছে। নারী জন্মকে চিরকালই অবহেলার চোখে দেখা হয়। আধুনিককালে আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতিতে সেক্স ডিটারমিনেশন দ্বারা কন্যা ভ্রূণ হত্যার ঘটনাও দেখা যায়। যদিও আইনানুযায়ী তা বন্ধ হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবী রাজস্থানের পরিবেশে 'বেটি কা বাপের' গল্পে শুনিয়েছেন, শিশুকন্যাকে আফিম খাইয়ে হত্যা করা হয়, মহেশ্বতা দেবী গিরিবালা গল্পে দেখান বিবাহের নামে কীভাবে বাবা মেয়েকে

বিক্রি করে দেয়। কবিতা সিংহ 'ভ্রূণা' কবিতায় লেখেন 'আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা / জন্ম দিওনা মা।' তবে উনিশ শতকে সুদক্ষিণা সেনের স্বামীর পরিবারের মতো আদর্শ উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারে মেয়েদের কদর আর আদর ছিল অনেক বেশি। তবে ঐ প্রেক্ষাপটেই মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের চিত্রটা ছিল অন্যরকম। সুতপা ভট্টাচার্য 'গোরা' উপন্যাস ধরে তুলনামূলক আলোচনায় দেখান, গোরার দাদা মহিম তার মেয়ে শশিমুখীর দশ বছর বয়স হবার আগেই বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আর পরেশবাবু তাঁর পালিতা কন্যা সুচরিতার বিয়ের জন্য আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করাকেই মান্যতা দেন। হিন্দুধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্ম ধর্মে আশ্রয় নিতে যেসব মেয়েরা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন, তাদের কথা ভেবেই বেথুন সাহেব স্কুল তৈরি করেন। ১২৭৪ সালের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা অনুযায়ী বালকদের তুলনায় বালিকাদের বুদ্ধি বেশি বলে প্রমাণিত হয়। আবার 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় দেখানো হয় কোমল স্বভাবের কারণে বিদ্যাক্ষেত্রে নারী বেশিদূর এগোতে পারবে না। এইরকম অস্বাস্থ্যকর ধারণা আমাদের দেশে বহুদিন পর্যন্ত চলেছিল। স্বাধীনতার পর রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শিক্ষা কমিশন স্বীকার করেছিলেন, শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্যের দিক থেকে নারী পুরুষের কোন ভেদ নেই কিন্তু মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গৃহরচনায়ও বাধা হতে পারে। এরপর কোঠারি কমিশনে (১৯৬৪-৬৬) বলা হয়—

> "In the modern world, the role of women goes much beyond the home and bringing up the children. She is now adopting a career of her own and sharing equally with the men, the responsibility for the development of society in all aspects."[১৯]

এই সুপারিশ অনুযায়ী আধুনিক বিশ্ব নারী স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়। বিশ শতকের প্রাক্কাল থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে, বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষমতাকে বেগম রোকেয়া 'সুলতানার স্বপ্ন'র মাধ্যমে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বাসরকক্ষের শৃঙ্খল ছেড়ে বেরিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদর বা মাতঙ্গিনী হাজরার মতো মহীয়সী নারীরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বীণা দাস, কমলা চক্রবর্তী কিংবা মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতেও ধরা আছে নারীর বীরত্বগাথা। আজকের দিনে মেয়েরা শিক্ষা-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-খেলা-কারিগরি দক্ষতা সব ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ করে চলেছে। সংসার সন্তান সামলে নারীর কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কল্পনা চাওলা, সুনিতা উইলিয়ামস এর মতো ভারতীয় মহাকাশচারী বা পাইলট দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাশকে এনেছে হাতের মুঠোয়। যশোধরা রায়চৌধুরী 'নূতন পাঁচালি' নামের লক্ষ্মীর পাঁচালীর বিনির্মিত কর্মে দেখিয়েছেন সব ক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণকে। আলোচ্য অধ্যায়ে ঋতদীপার ডায়েরি অংশে আয়েশার তথ্য অনুযায়ী দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'র প্রসঙ্গ আসে, যেখানে নারীর সামর্থ্যের নানা চিত্র দেখানো হয়েছিল। এই সামর্থ্য ও সক্ষমতার রেশ টেনেই দেখা যায় 'সখি সংলাপ' সভার দুই সদস্য দ্যুতি ও শ্রুতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরির ছাড়পত্র পেয়েছে এবং শ্রবণা-ও স্টাডি লিভ নিয়ে বিদেশে পড়তে যাবার আয়োজন শুরু করেছে। বোঝা যায়, নারী আর গৃহকোণে বন্দি নয় তার সামর্থ্য ও সক্ষমতা দেশের পরিধি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যচর্চা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অসম্পূর্ণ। তিনি এমন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যার প্রভাব আরো বহু ক্ষেত্রের মতো নারীর জীবনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই 'মেয়েলি সংলাপ' বইটির শেষ তথা চতুর্দশ অধ্যায় 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ।' লেখিকা এই অধ্যায় নিজের স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গে মাত্র সতেরো বছর বয়সে বাবার থেকে ২৬ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী উপহার হিসেবে পাওয়ার আনন্দকে জীবনে যেন অখণ্ড আকাশ উন্মোচিত হবার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর সূত্রে আসে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রসঙ্গ, যেখানে নর-নারীর সম্পর্কের নবরূপায়ন লক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে মাধ্যম থাকে মেয়েদের পড়াশোনা। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-

বিনোদিনীর সম্বন্ধ প্রগাঢ় হয় বঙ্কিম উপন্যাসের পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে আর 'শেষের কবিতা'র অমিত লাবণ্যর মানসিক সূক্ষ্মতারও মাঝে সেতুবন্ধন স্বরূপ থাকে জন ডানের কবিতার বই। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ আর সন্দীপের বইকেন্দ্রিক ভাবনা ভিন্নমুখী। নিখিলেশের মানসিকতা বোঝাতে আসে এমিয়েলের জার্নালের উল্লেখ, যা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'চতুরঙ্গ'তে দামিনীর গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের অস্ত্র হয় শ্রীবিলাসকে দিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের বই আনিয়ে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পর্যায়ে বইয়ের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেখান থেকে ইন্টারনেট নির্ভর চ্যাট অনেকখানি ঘরে এসেছে। তবে রবি ঠাকুরের সৃজনকর্ম সম্বলিত 'ছিন্নপত্রাবলী', 'লিপিকা' বা 'পূরবী' যদি আজকের দিনে উপহার হিসেবে দেওয়া যায়, তবে প্রিয়জন খুশি হবে বলে মনে করেন সুতপা ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর নানান সামাজিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তার নিদর্শন ছোটগল্পগুলি— পণপ্রথা ('দেনা পাওনা'), মেয়েদের অন্যায় ভাবে 'বাঁজা' বলে অপমান করা ('পুত্রযজ্ঞ'), নিম্নবর্গীয় শোষিত মানুষের অসহায়তা থেকে উদ্ভূত নির্মমতায় বলিপ্রদত্ত নারী ('শাস্তি')। এরকম প্রতিবাদ আরো অনেকের লেখায় থাকলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ স্পষ্ট। 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, 'পহেলা নম্বর'-এর অনিলা বা 'শাস্তি'র চন্দরার মৃত্যুদণ্ড বরণের মাধ্যমে প্রতিবাদী নারীর ব্যক্তিস্বরূপ বারে বারে উন্মোচিত হয়। নাটকে নারী চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার দুই ভিন্ন দিককে দেখাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা বাইরে নিঃস্ব ভিখারি কিন্তু অন্তরসম্পদে ঐশ্বর্যময়ী আবার গুণবতী বাইরে রাজগরবিনী অন্তরে দীন। রাজা নাটকে সুদর্শনা রাজার প্রেমাস্পদা বলে অহংকারী হয়েও বোধহীন বলে রাজার প্রকাশ বুঝতে পারে না। আর সুরঙ্গমা দাসী হয়েও অন্তর সম্পদে ঐশ্বর্যবতী। 'নটীর পূজা'র রাজকন্যা রত্নাবলী অহংকারে মুখরা আর শ্রীমতি নটী বলে অবজ্ঞার পাত্রী হয়েও অন্তর সম্পদে দৃঢ়। দুই বিপরীত ধর্মী নারী চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে নারীকে স্বরূপত্য চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রবীন্দ্র ভাবনা যেমন চিরন্তন, তেমনি নারী ভাবনা ব্যতীত রবীন্দ্র সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। সে জন্যই বোধ হয় 'সখী সংলাপ'এর সদস্য শ্রবণা 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'ঘরে বাইরে'-কে নিজের মতো করে ভেবে তাকে কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই তার সৃষ্টির মাধ্যমে যুগ যুগান্তর ধরে সৃষ্টিশীল নারীর হৃদয়ে নিজের স্থান করে নেবেন। তিনি ভবিষ্যৎ নারীর তথা সমগ্র মানবকুলের হৃদয়ে শাশ্বত চিরন্তন হয়ে থাকবেন বলে মনে করেন লেখিকা।

১৪ টি অধ্যায় আলোচনার শেষে বোঝা যায় লেখিকা সুতপা ভট্টাচার্য সমাজে ও সাহিত্যে মেয়েদের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে যেমন প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ ও সমাজ দর্পণ অনুযায়ী নারীর অবস্থানকে দেখাতে চেয়েছেন, তেমনি 'সখী সংলাপ'-এ অংশগ্রহণকারী মেয়েদের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাক্রমকেও সজ্জিত করেছেন আলোচ্য 'মেয়েলি সংলাপ' গ্রন্থে। নারীর প্রকৃত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারক পুরুষের অংশগ্রহণ ও আইনকে তিনি স্বীকৃতি দেবার পাশাপাশি নারীকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য দায়ী করেছেন নারী পুরুষের সম্মিলিত বিকৃত মানসিকতায় সৃজিত পুরুষতন্ত্রের দাপটকে। নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, তা তিনি অকুণ্ঠচিত্ত সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত লেখিকা বিশ্বাস করেন, নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা চিহ্নায়নের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা গণ্ডি থাকে না, এ এক অনন্ত যাত্রা। এই যাত্রাপথের আনন্দগানে তিনি তাঁর ছাত্রীসমা ভবিষ্যৎ নারীদের সেই দায়িত্বভার তুলে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। লেখিকার সেই আহবানে সামিল হন তার পাঠককূল। সবমিলিয়ে যৌথতা-বিশ্বাস-ভালোবাসা প্রাচীনত্বের স্বীকরন আর নবীনের আত্তিকরণে সমৃদ্ধ হয় সামগ্রিক পরিক্রমা, আলোকিত হয় নারীর নিজস্ব ভুবন।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য, সুতপা। লেখিকাদের লেখালেখি। ভৌমিক, তাপস (সম্পা)। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি— এপ্রিল ২০১৭, R.N— 41092/82, পৃ. ১০।
২। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। প্রথম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১৭।
৩। ঘোষ, শাশ্বতী। 'পরিবারের অর্থনীতি'। চন্দ, পুলক (সম্পা)। "নারীবিশ্ব"। গাংচিল, ২০০৮, পৃ. ৫০০।
৪। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। প্রথম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১৯।
৫। তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়। পৃ. ২৮।
৬। লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা। 'নারীর পৃথিবী'। "নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম"। র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি- ২০১১, পৃ. ১৩।
৭। ভট্টাচার্য, সুতপা, মেয়েলি সংলাপ। তৃতীয় অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ৩০।
৮। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'খোলনলচে বদলে ফেলুন পরিবারের'। "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ"। আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৬৫।
৯। https;//pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10321178
১০। বাগচি, যশোধারা। 'মাতৃত্ব ও পিতৃতন্ত্রিকতা'। চন্দ, পুলক (সম্পা)। "নারীবিশ্ব"। গাঙচিল, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৫৫৫।
১১। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। অষ্টম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩,পৃ. ৯৬-৯৭।
১২। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'নারী ও সংবিধান'। "পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র"। বিকাশ গ্রন্থভবন, ২০০২, পৃ. ৮২।
১৩। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। নবম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১২০।
১৪। পোলিট, হ্যারি (সংকলক)। 'মেয়েদের গোলামি'। "নারী ও কমিউনিজম: মার্কস থেকে মাও"। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ২১-২২।
১৫। বিশ্বাস, অমিত রঞ্জন। 'সে পণ্য সে ঊন মানব'। চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য (সম্পা), "রোববার— প্রতিদিন", নিশির ডাক, ১৮ আগস্ট ২০২৪, পৃ. ১১।
১৬। লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা (সম্পা)। নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম। র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩-১৪।
১৭। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। দ্বাদশ অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১৭৪।
১৮। তদেব, ত্রয়োদশ অধ্যায়। পৃ. ১৯২।
১৯। তদেব, পৃ. ১৯২।